IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ব্যাকরণশাস্ত্রচর্চায় ভারতবর্ষ ও সংস্কৃতভাষা

বিশ্বজিৎপাত্র
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী

সারসংক্ষেপ

মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার বিভিন্ন মাধ্যম থাকলেও শ্রেষ্ঠ মাধ্যমটি হল মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সুস্পষ্ট সার্থক ধ্বনিসমষ্টি বা ভাষা। এই ভাষা নদীর স্রোতের মত পরিবর্তনশীল। বিশেষ কিছু ব্যবস্থা না নিলে যেমন নদীর স্রোতকে নির্দিষ্ট গতিপথে বেঁধে রাখা যায় না ঠিক তেমনি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে প্রয়োগ করলে ভাষাও তার মূলরূপ থেকে সরে গিয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে। এটি একটি স্বাভাবিক নিয়ম। এতে আমাদের কিছু লাভও হয়, আবার কিছু লোকসানও হয়। এর ফলে আমরা যেমন ভাষার কিছু নতুন রূপ দেখতে পাই, ঠিক অপরদিকে অদূর ভবিষ্যতে মূলভাষায় রচিত সাহিত্যকৃতি তথা অমূল্য কিছু তথ্যকে যথাযথভাবে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। শুধু তাই নয় অনেক সময় কোন অর্থ বুঝতেই আমরা সমর্থ হই না। সেই সঙ্গে হারিয়ে যায় আমাদের অতীত। তাই প্রাচীন পণ্ডিতরা তাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে মূলভাষাকে একটি নির্দিষ্ট স্রোতে বেঁধে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন; সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন শাস্ত্রের, সৃষ্টি হয়েছে ব্যাকরণের। মূলত এই ব্যাকরণ চর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই ভারতবর্ষের মাটিতেই এবং তা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত অবহেলিত, অনাদরণীয় সংস্কৃত ভাষার হাত ধরেই। বর্তমান সময়ের উন্নত দেশগুলিও যখন ব্যাকরণশাস্ত্রচর্চা নিয়ে তেমন কিছু ভাবতে পারেনি, সেই সময়েই ভারতবর্ষের মাটিতে অত্যন্ত সুক্ষ্ম, সুগভীর ও বিস্তৃতভাবে ব্যাকরণচর্চা হয়েছে যা বিশ্বের দরবারে ব্যাকরণচর্চায় ভারতবর্ষের হাতে অগ্রপথিকের পতাকা তুলে দিয়েছে। আমি এই প্রবন্ধে কিছু তথ্য সহযোগে বিশ্বের দরবারে ব্যাকরণচর্চায় ভারতবর্ষের অগ্রপথিকের ভূমিকা ও সংস্কৃতভাষার অবদান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যক্ত করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি মাত্র।

সংকেত শব্দ

ভারতবর্ষ, সংস্কৃতভাষা, ব্যাকরণশাস্ত্র, বৈয়াকরণ, পাণিনি, অগ্রপথিক, পাশ্চাত্য

ভূমিকা

পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত জড়-অজড়, পার্থিব পদার্থের মধ্যে মানুষই যে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা প্রভৃতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর তা মানতে আমাদের কারোরই অসুবিধা হয় না। পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ জীবের উৎপত্তি সম্পর্কেও বহুবিধ বিতর্কিত তথ্য সকলের অবগত, তা বিজ্ঞানের দিক থেকেই হোক বা ধর্মীয় দিক থেকেই হোক। ডারউইনের বিবর্তনবাদও সকলে সর্বান্তকরণে স্বীকার করেন কিনা তা নিয়েও যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে, আর মনুরকাহিনি, ঈশামুসার কাহিনি, মহম্মদের কাহিনি সবই তো চরমপন্থী ধর্মাধিকারী ছাড়া সকলের কাছে সংশয়ান্বিত। যাই হোক, যেভাবেই হোক মানবের উৎপত্তি তা আমার আলোচনার বিষয় নয়। আসলে মানুষ যে মাধ্যমটির উপর নির্ভর করে নিজেদের মনের ভাবপ্রকাশ করে একে অপরের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেই স্ফুট শব্দরাশি তথা ভাষাবিজ্ঞানীদের দেওয়া পোশাকি নাম 'ভাষা' সম্পর্কে কিছু কথা এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী ভাষা সংস্কৃত তথা সাহিত্য কিভাবে বর্তমান সময়ে বহুচর্চিত ব্যাকরণশাস্ত্রে অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা তার গভীর অবদান রেখেছে তা পাঠকের কাছে তুলে ধরা। বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত অবহেলিত ও অনাদরণীয় হয়ে উঠেছে। এমনকি তাকে আমরা আমাদের অজ্ঞানতার কারণে মৃতভাষা বা মৃতপ্রায় ভাষায় আখ্যায়িত করে থাকি। মূলত এই প্রবন্ধে আমি ব্যাকরণশাস্ত্রে পৃথিবীর অন্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতভাষা তথা সংস্কৃতসাহিত্য কি অবদান রেখেছে সেই তথ্যই আপনাদের কাছে তুলে ধরার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি মাত্র।

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ যাই হোক না কেন আমাদের চিরযুক্তিবাদী মন সাধারণভাবে বিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাই ডারউইনের মতবাদ অনুসারেই প্রথমে এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের, জলচর থেকে উভচরের, উভচর থেকে স্থলচরের, অতঃপর বানর ও তা থেকে মানবের সৃষ্টি। এবার চলে যাই সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগে বা তারও কিছুটা পিছনে যখন মানুষ শুধুমাত্র জৈবিক প্রয়োজনে পশুর মত অস্ফুট আওয়াজ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সাংকেতিকভাবে একে অপরের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করেছে। তারপরে ক্রমে নির্দিষ্ট ধ্বনি সহযোগে নির্দিষ্ট বিষয়কে বুঝিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। সৃষ্টি হয়েছে এক মাধ্যমের, সৃষ্টি হয়েছে ভাষার।

এখন মনের ভাব প্রকাশের জন্য অনেক মাধ্যম আছে। যেমন- ১. বিভিন্ন যন্ত্র বা বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণজনিত আওয়াজের মাধ্যমে ২. বিভিন্ন আকার ইঙ্গিত, নৃত্যের মাধ্যমে ৩. চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মূর্তি প্রভৃতির মাধ্যমে ৪. সুনির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে। মূলত এই চার প্রকারেই আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীরা একমাত্র অন্তিম প্রকারের ভাব প্রকাশের মাধ্যমটিকেই অর্থাৎ মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টিকেই সাধারণভাবে ভাষা সংজ্ঞায় সজ্ঞায়িত করে থাকেন। এই ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাক্‌যন্ত্রের উচ্চারণের তারতম্যের কারণে, ভৌগলিক পার্থ্যকের কারণে ভাষা তার পূর্ববর্তী রূপ থেকে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে নতুন রূপ ধারণ করে। তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন উপভাষার। যেমন আধুনিক কথ্য বাংলা ভাষার কথাই ধরুণ; রাঢী, বঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী প্রভৃতি পাচঁটি উপভাষার সৃষ্টি হয়ে গেছে। মূলভাষার এইরকম পরিবর্তনকে আটকানো তথা মূলস্রোতে বেঁধে রাখার জন্য সংস্কৃত ভাষার হাত ধরেই মূলত ব্যাকরণশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল। আর এই ব্যাকরণচর্চার আদি পীঠস্থান ছিল আমাদের ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে বা ভাষায় ব্যাকরণশাস্ত্র নিয়ে এত সুগভীর সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতকারে আলোচনা হয়নি। প্রাচীন গ্রীসে হয়ত কিছুটা আলোচনা হয়েছে তবে তা ভারতবর্ষের মত এত বিস্তৃতভাবে হয়নি আর সময়ের বিচারেও ভারতবর্ষের থেকে অনেকেটাই পিছিয়ে।

ভাষা ও ব্যাকরণ

পণ্ডিতদের মধ্যে সাধারণত যেমন অন্যান্য বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা যায় ঠিক তেমনি ভাষার সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। তাই ভাষার বহুবিধ সংজ্ঞাও রয়েছে। তবে প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বেশ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন তার মতে- 'মনের ভাবপ্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।'

এবার আসি ব্যাকরণের কথায় ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগপূর্বকং শব্দাঃ অনেনেতি ব্যাকরণম্ অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগ যে শাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মের মাধ্যমে করা হয় তাকেই মূলত ব্যাকরণশাস্ত্র বলা যেতে পারে। বস্তুত ব্যুৎপত্তিগত (বি-আ-কৃ+ল্যুট্ করণে) অর্থের দিক থেকে বিচার করলে ব্যাকরণশব্দের অর্থ হবে ব্যাকৃত করা বা বিশ্লেষণ করা। ভাষায় শিষ্টজনের ব্যবহৃত সাধুশব্দের বিশ্লেষণ করাই হল ব্যাকরণের প্রধান কাজ। এই সাধুশব্দের প্রতি দৃষ্টি রেখেই মূলত ব্যাকরণের সূত্রাদি বা নিয়ম প্রণয়ন করা হয়। তাই পতঞ্জলি ব্যাকরণকে বলেছেন 'শব্দানুশাসনম্' এবং বাক্যপদীয়কার ভতৃহরিও একই কথা বলেছেন- 'সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ'

ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব

ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চার ইতিহাস কতটা প্রাচীন বা কবে থেকে ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চা শুরু হয়েছে তা আলোচনা করতে গেলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিত নির্বিশেষে সকলকেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের প্রাচীনতমা ভাষা সংস্কৃতের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও সংস্কৃতভাষার আনুমানিক সময়কাল নির্ণয়ে ম্যাক্সমুলার মহাশয়ের প্রদত্ত মতটিই বহুপ্রচলিত। তার মতানুসারে সংস্কৃতভাষার আনুমানিক কাল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর আগে ধরা হয়। যদিও পাশ্চাত্য আরও এক পণ্ডিত উইন্টারনিজ্ বৈদিক সভ্যতার কাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ বলেছেন অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে। আবার প্রাচ্য পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় জ্যোর্তিবিজ্ঞান অনুসারে বিবেচনা করে ঋগ্বেদের কাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব সাড়ে চার হাজার অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে বৈদিক সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই একই সুর পাশ্চাত্য পণ্ডিত জ্যাকবির গলাতেও শোনা যায়। যাই হোক, বৈদিক সভ্যতার কাল নিয়ে পূর্বে বহু বিতর্ক হয়েছে আজও চলছে। বর্তমান সময়ে এখনও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা, গবেষণার সাথে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা এবিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন। এখন প্রশ্ন হবে ব্যাকরণের চর্চা করতে করতে হঠাৎ বৈদিক সভ্যতার কাল নিয়ে পড়লাম কেন? আমরা সবাই প্রাচীন বৈয়াকরণ ও ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম বললেই

প্রথমেই আমাদের সকলের মনে পাণিনি ও তার অষ্টাধায়ী গ্রন্থের কথা মনে আসে এবং অনেকেই ভাবেন পাণিনিই হলেন প্রথম বৈয়াকরণ ও অষ্টাধ্যায়ী হল প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। কিন্তু এই ধারণা আমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারণেই হয়ে থাকে। পণ্ডিতেরা মহামুনি পাণিনির সময়কাল হিসাবে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম শতাব্দী বলে থাকেন। যারা পাণিনিকে প্রথম বৈয়াকরণ হিসাবে ভাবেন তাদের মতানুসারে তাহলে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীকেই ব্যাকরণচর্চার শুভারম্ভ হিসাবে ধরতে হয়। কিন্তু যদি একটু গুরুত্ব সহকারে দেখা যায় তাহলে এই সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে কারণ মহামুনি পাণিনি সংস্কৃত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফল ও জনপ্রিয় বৈয়াকরণ হলেও তিনি কিন্তু প্রথম বৈয়াকরণ নন। পাণিনির বহুপূর্বেই বেদরক্ষা তথা সংস্কৃত ভাষাকে মূলস্রোতে বেঁধে রাখার জন্য ভারতবর্ষে ব্যাকরণচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে কেন আমি বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয়ের আলোচনাটা করেছিলাম। আসলে দেখা যায় বৈদিক সময় থেকেই ব্যাকরণচর্চা শুরু হয়েছিল, হয়তো সেটা বিস্তৃত আকারে না হয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে হত। এবং কালক্রমে সেটির চর্চা হতে হতে পাণিনির সময়ে এসে এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল এবং সুসজ্জিত শাস্ত্রচর্চার রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। সুতরাং খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী নয় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-১৫০০ শতাব্দী বা খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বা খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ বছর আগেই ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ভারতবর্ষের মাটিতে ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চা শুরু হয়েছিল। পৃথিবীর আর কোন দেশ তখন হয়তো বিধিবদ্ধভাবে ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করার কথা ভাবতেই পারেনি। এবার আমরা একটু দেখে নেব পাণিনির পূর্ববর্তী কিছু বৈয়াকরণদের কথা ও বৈদিক সময়ে ব্যাকরণ চর্চার সূচনার ইতিহাস।

মহাদেবের মাহেশ ব্যাকরণ

ব্যাকরণের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে অনেকেই দেবাদিদেব মহাদেবকেই স্বীকার করেন। তার উপদিষ্ট ব্যাকরণের নামই মাহেশ ব্যাকরণ। যদিও এই গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান এবং বর্তমানে এই গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অনেক প্রাচীন গ্রন্থে এই ব্যাকরণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাণিনীয় শিক্ষায় উল্লেখ আছে-

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাদ্।

কৃতস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নম:।।"

ভবিষ্যপুরাণে আছে-

"ইতি শ্রুত্বা মহাদেব: সূত্রাণি প্রদদৌ মুদা।

সর্ব্ববর্ণময়ান্যেব অইউণাদি শুভানি বৈ।।" ২/৩২/১০

এছাড়াও প্রাচীন আচার্যরা মাহেশ ব্যাকরণের মহত্ব উল্লেখ করে একটি গাথাব লতেন-

"সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরং হি বৃহস্পতৌ।

তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দুতপতিতং হি পাণিনৌ।।"

মূলত এই শ্লোকগুলি থেকে তিনি যে একজন বৈয়াকরণ ছিলেন তা যেমন প্রমাণিত হয় ঠিক তেমনি তিনি যে ব্যাকরণশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা ছিলেন তারও প্রমাণ মেলে।

ব্রহ্মা

অনেকে যেমন মহাদেবকে ব্যাকরণশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা হিসাবে মনে করেন ঠিক তেমনি অনেকে ব্রহ্মাকেও ব্যাকরণশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা হিসাবে বলে থাকেন এবং তারাও প্রমাণ দেন সকলের পরিচিত 'ঋক্তন্ত্র' নামক গ্রন্থের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করে "ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতিরিন্দ্রায়, ইন্দ্রো ভরদ্বাজায়, ভরদ্বাজ ঋষিভ্য:, ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্য:" (ঋক্তন্ত্র১/৪)। যদিও ব্রহ্মার লিখিত ব্যাকরণ গ্রন্থ আমাদের কাছে উপলব্ধ নয়।

বৃহস্পতি

শাকটায়নের ঋক্তন্ত্রের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে বৃহস্পতি হল ব্যাকরণশাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রবক্তা। ঋক্তন্ত্র ছাড়াও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্রবছর ধরে প্রত্যেকটি পদের ব্যাকরণের উপদেশ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়- "বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ, নান্তং জগাম।" (মহাভাষম্, পস্পশাহ্নিক)

ইন্দ্র

ঋক্তন্ত্র ও মহাভাষ্যের উদ্ধৃতি অনুসারে ব্রহ্মা ও বৃহস্পতির পরেই ব্যাকরণের তৃতীয় প্রবক্তা হিসাবে ইন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, ঐন্দ্রব্যাকরণ যে ছিল তারও উল্লেখ আছে। আমরা পরবর্তীকালের গ্রন্থকারদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে তা জানতে পারি। যেমন ভট্টারক হরিশ্চন্দ্রের চরকব্যাখ্যায় পাওয়া যায়- 'অথ বর্ণসমূহ: ইতি ঐন্দ্রব্যাকরণস্য।' দুর্গাচার্যের নিরুক্তিবৃত্তিতে দেখা যায়- 'নৈকং পদজাতম্। যথা অর্থ পদম্ ইত্যৈন্দ্রাণাম্।' কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়সংহিতাতেও বৈয়াকরণ হিসেবে ইন্দ্রের নাম উল্লেখিত হয়েছে- 'বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ। তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্, ইমাং নো বাচাং ব্যাকুর্বিতি। তামিন্দ্রো মধ্যতোবক্রম্য ব্যাকরোৎ" (তৈ. সং. ৬/৪/৭)। প্রতিবাক্যের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন- "তামখণ্ডাং বাচাং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগং সর্বত্রোকরোৎ" এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করে বলা যায় যে অখণ্ড বাক্-কে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিক্রমে বিভক্ত করে ইন্দ্রই প্রথম ব্যাকরণের সংস্কার করেন। আর সেজন্যই তাকে ব্যাকরণের প্রথম সংস্কর্তা বলা হয়। আবার অনেকের মতে বহুপ্রচলিত বহুচর্চিত কলাপ বা কাতন্ত্রব্যাকরণও ঐন্দ্রসম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

এখন ঐন্দ্রসম্প্রদায়ের কথা বলাতে প্রশ্ন হবে ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে এইরকম একটি বা একাধিক সম্প্রদায় কি ছিল? উত্তরে বলব হ্যাঁ। আমরা যেমন কোন একটি বিষয় বিভিন্ন জন বিভিন্ন মাষ্টারমশাইয়ের কাছে পড়ি এবং তার প্রদত্ত জ্ঞান অর্জন করে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ ও অনুসরণ করে চলি এবং মাষ্টারমশাইদের জ্ঞান ও বোঝানোর শৈলীর ভিন্নতার কারণে তাদের শিষ্যদের মধ্যেও পার্থক্য তৈরি হয় এবং এরা রামবাবুর শিষ্য, এরা শ্যামবাবুর শিষ্য এইরকম সম্প্রদায় তৈরি হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রেও তা সৃষ্টি হয়েছিল। আচার্য যাস্ক তার 'কবিকল্পদ্রুম'-এ ৮ জন প্রাচীন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করেছেন-

"ইন্দ্রশ্চন্দ্র: কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়ন: ।

পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকা:।।"

আরেকটি প্রসিদ্ধ কারিকাতে নয়টি ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়-

"ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।

সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং অথ পাণিনীয়কম্।।"

মহর্ষি বাল্মিকীর রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হনুমানকে 'নবব্যাকরণবেত্তা' বলা হয়েছে- "সোয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা।" (রামায়ণ উ. কা. ৩৬/৪৭)

ভাগুরি

ভাগুরিও একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ছিলেন। কাত্যক্য মুনির বৃহৎদেবতায় ভাগুরির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবত ভাগুরি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ববর্তী ছিলেন। অনেকে আবার তাকে মার্কণ্ডেয় মুনির সমসাময়িক বলে থাকেন। তিনি 'ত্রিকাণ্ডকোষ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যদিও সেটি বর্তমানে উপলব্ধ নয়। তিনি ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ ও আভিধানিক। তাই Aufrecht মহোদয় তার Catalogs Catalogorum গ্রন্থে ভাগুরিকে Lexicographer এবং Grammarian বলে উল্লেখ করেছেন। তার রচিত গ্রন্থে খুব সম্ভবত 'অবাপ্যোরল্লুবা' বলে কোন সূত্র ছিল। তাই তার উল্লেখ পাণিনি সম্প্রদায়ের উক্তিতে পাওয়া যায়-

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়ো:।

টাপং চাপি হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা।।"

কাশকৃৎস্ন

পূর্বে উল্লেখিত 'ইন্দ্রশ্চন্দ্র: কাশকৃতস্নাপিশলী শাকটায়ন: ......' কারিকাংশে কাশকৃৎস্নের নাম বৈয়াকরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন কবিকল্পদ্রুমকার বোপদেব গোস্বামী। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখেছেন 'ত্রয়োধ্যায়া: পরিমাণস্য সূত্রস্য ত্রিকং কাশকৃৎস্নম্' ৫//১/৫৮ এবং কাশকৃৎস্ন: ৪/২/৬৫। এই সমস্ত উল্লেখ দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে কাশকৃৎস্ন একজন পাণিনি পূর্ববর্তী বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ছিলেন। কাশকৃৎস্ন নামক ব্যাকরণের তিনটি অধ্যায় ছিল ও যারা এই ব্যাকরণ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করতেন তাদেরও 'কাশকৃৎস্ন' বলা হত। বর্তমানে কাশকৃৎস্নের কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ উপলব্ধ নয়। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে শুধুমাত্রই বৈয়াকরণ হিসাবে কাশকৃৎস্নের নামোল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

শৌনক

সংস্কৃত ব্যাকরণ জগতে বৈয়াকরণ হিসাবে শৌনকের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার রচিত ‘বৃহদ্দেবতা’ নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের দেবতাদের বিবরণ আছে। তাসত্ত্বেও গ্রন্থটিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে ছয় প্রকার সমাস, উপসর্গ, এবং নিপাতের বৈশিষ্ট্য, পদের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। তার রচিত বহুল প্রচলিত বহুসমাদৃত ঋক্প্রাতিশাখ্যেই সর্বপ্রথম নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এই চার প্রকার পদের সুসংবদ্ধ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাড়ি

ব্যাড়িও একজন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ছিলেন। তবে পণ্ডিতদের মতে দুইজন ব্যাড়ি ছিলেন। একজন বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ি, শৌনক ভার্গবের শিষ্য ও পাণিনি পূর্ববর্তী, আর একজন পাণিনির মাতুল বা মাতুলপুত্র দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। ঋক্প্রাতিশাখ্য প্রণেতা শৌনকের পিতামহের শিষ্য ছিলেন বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ি। এবং জনমেজয় বা পরীক্ষিতের সমসাময়িক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। শৌনক ঋক্প্রাতিশাখ্যে ব্যাড়ির নাম উল্লেখ করেছেন- ‘উভে ব্যাড়ি: সমস্বরে’ (৩/১৩), ‘পরেষাং ন্যাসমাচারং ব্যাড়িস্তৌ চেত স্বরৌ পরৌ’ (৩/৮), ‘ব্যাড়ে: সর্বত্রাভিধানলোপ:’ (৬/২১) ইত্যাদি উক্তিতে। এই সমস্ত উক্তি থেকে সহজেই অনুমান হয় যে ব্যাকরণের উপর ব্যাড়িপ্রণীত কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও শৌনক ঋক্প্রাতিশাখ্যে শাকল্য ও গার্গ্যের সাথে ব্যাড়ির নামও উল্লেখ করেছেন একটি কারিকাতে-

“সমাপাদ্যং নাম বদন্তি ষত্বং তথা ণত্বং সামবশাংশ্চ সন্ধীন্।

উপাচারং লকষণতশ্চ সিদ্ধমাচার্য্যা ব্যাড়িশাকল্যগার্গ্যা:।।” (১৩/১২)

এইরকমভাবে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে পাণিনি পূর্ববর্তী বহু বৈয়াকরণের নাম আমরা দেখতে পাই। আমরা তো এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট বৈয়াকরণের নাম উল্লেখ করেছি। এনারা ছাড়াও বায়ু, ভরদ্বাজ, চারায়ণ, শান্তনু, গৌতম প্রভৃতি বৈয়াকরণদের নাম বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থে প্রায় ৬০ জন আচার্যের নাম পাওয়া যায়। যেমন অগ্নিবেশ্য, আত্রেয়, বাভ্রব্য প্রভৃতি। প্রয়োজনে গুরুপদ হালদার মহাশয়ের ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। শুধু তাই নয় পাণিনি স্বয়ং তার অষ্টাধ্যায়ীতে কুড়িটি সূত্র সহযোগে ১০ জন প্রাচীন বৈয়াকরণদের নাম সাক্ষাৎভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন আপিশলি, কাশ্যপ, গালব, গার্গ্য, চাক্রবর্মণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক ও স্ফোটায়ন।

আপিশলি

আপিশলি হলেন পাণিনি পূর্ববর্তী একজন বৈয়াকরণ। অষ্টাধ্যায়ীর ‘বা সুপ্যাপিশলে:’ (৬/১/৯২) সূত্রে পাণিনি আপিশলির নাম উল্লেখ করেছেন। শুধু অষ্টাধ্যায়ীতে নয় জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকা, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, নাগেশের প্রদীপটীকা প্রভৃতিতে আপিশলির নাম উল্লেখিত হয়েছে। শ্রীতত্ত্বনিধির মতে নয়টি ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আপিশল সম্প্রদায় ছিল অন্যতম। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মতো আপিশল ব্যাকরণও অষ্ট অধ্যায় বিশিষ্ট সূত্রাত্মক গ্রন্থ ছিল। তাই শাকটায়ন অমোঘবৃত্তিতে লিখেছেন ‘অষ্টকা আপিশলপাণিনীয়া:’ আপিশল ব্যাকরণে শুধু সূত্রপাঠ নয় অন্যসম্প্রদায়ের মতো ধাতুপাঠ, গণপাঠ এবং শিক্ষাশাস্ত্রও ছিল। এর মধ্যে কেবলমাত্র শিক্ষাশাস্ত্রই এখন অবধি রয়েছে এবং সেটি ‘আপিশলীয়শিক্ষা’ নামে নানা স্থানে মুদ্রিত হয়েছে।

কাশ্যপ

অষ্টাধ্যায়ীর দুটি সূত্রে আচার্য কাশ্যপের নাম উল্লেখিত হয়েছে। ‘তৃষিমৃষিকৃষে: কাশ্যপস্য’ (১/২/২৫) এবং ‘নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্’ (৮/৪/৬৭) এগুলি থেকে বোঝা যায় যে তিনি পাণিনির পূর্বেকার একজন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ছিলেন এবং তার ব্যাকরণ ‘কাশ্যপীব্যাকরণ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও বর্তমানে তার কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। মহর্ষি কাত্যায়ন তার বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে কাশ্যপের একটি বিধির উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ‘লোপং কাশ্যপশাকটায়নৌ’। এছাড়াও নিপাতের আলোচনায় কাশ্যপের যে বিশেষ অবদান আছে তা এই প্রাতিশাখ্যেরই অন্য একটি শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-

“ভরদ্বাজকমাখ্যাতং ভার্গবং নাম ভাষ্যতে।

বসিষ্ট উপসর্গন্ত নিপাত: কাশ্যপ: স্মৃত:।।”

অর্থাৎ মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশেষভাবে আখ্যাতের, মহর্ষি ভৃগু বিশেষভাবে নামের, মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশেষভাবে উপসর্গের এবং মহর্ষি কাশ্যপ বিশেষভাবে নিপাতের আলোচনা করেছিলেন।

শাকটায়ন

'লঙ: শাকটায়নস্যৈব' (৩/৪/১১১) 'ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতর: শাকটায়নস্য' (৮/৩/১৮), 'ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য' (৮/৩/১৮) প্রভৃতি সূত্রে আচার্য শাকটায়নের নাম উল্লেখিত হয়েছে। ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, নিরুক্ত, মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থেও শাকটায়নের উল্লেখ দেখা যায়। পতঞ্জলি স্পষ্টতই বলেছেন- 'ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্'। এছাড়াও সমস্ত নামপদই যে আখ্যাতজ তা বলতে গিয়ে যাস্কাচার্য বলেছেন- 'তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ'। যদিও শাকটায়নের কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ আমরা পাইনা তথাপি তিনি যে একজন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গার্গ্য

অষ্টাধ্যায়ীর তিনটি সূত্রে পাণিনি পূর্বাচার্য গার্গ্যের নাম উল্লেখ করেছেন- 'অতো গার্গ্যস্য' (৮/৩/২০) 'অঙ্ গার্গ্যগালবয়ো:' (৭/৩/৯৯) 'নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্' (৮/৩/৬৭) এছাড়াও যাস্কাচার্যের নিরুক্তে গার্গ্যের নাম বহুবার উল্লেখিত হয়েছে- 'উপসর্গা উচ্চাবচা ভবন্তীতি গার্গ্য:' (১/১/৩/৫), 'ন সর্ব্বাণীতি গার্গ্য:' (১/৩/১/৩) এছাড়াও বৃহৎদেবতা, পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থেও গার্গ্যের নাম পাওয়া যায়। তার সম্পূর্ণ নাম গার্গ্য বালাকি। তার প্রণীত ব্যাকরণকে সাধারণভাবে গার্গীয় ব্যাকরণ বলা হলেও সেটি 'অক্ষরতন্ত্র' নামে প্রচলিত ছিল। গার্গ্যের ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় অনেক অভিমত ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য, নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে গার্গ্যের কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ বা তার সূত্রাদি পাওয়া যায় না।

গালব

গার্গ্যের মতোই অষ্টাধ্যায়ীর বেশ কয়েকটি সূত্রে গালবের নাম পাণিনি নিজে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল 'ইকো হ্রস্বঙ্যো গালবস্য' (৬/৩/৬১), 'তৃতীয়াদিষু ভাষিতপুংস্কং পুংবদ্ গালবস্য' (৭/১/৭৪), 'অঙ্ গার্গ্যগালবয়ো:' (৭/৩/৯৯), 'নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্' (৮/৩/৬৭) এছাড়াও নিরুক্ত, বৃহৎদেবতা, পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থেও গালবের নাম পাওয়া যায়। মূলত গালবের মত যারা অনুসরণ করত তাদেরকে 'গালব' বলা হত। তাই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তার মহাভাষ্যে 'গালবাঃ' পদের প্রয়োগ করেছেন- "প্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্ বহুলম্ (৪/১/১৬০) ইতি গালবা এব হ্রস্বান্ প্রযুঞ্জীরন্, প্রাক্ষু চৈব হি ফিন্ স্যাৎ"।

চাক্রবর্মণ

অষ্টাধ্যায়ীর 'ঈ চক্রবর্মণস্য' (৬/১/১৩০) সূত্রে পাণিনি আচার্য চাক্রবর্মণের নাম উল্লেখ করেছেন। অষ্টাধ্যায়ী ছাড়াও ভট্টোজিদীক্ষিতের শব্দকৌস্তভ ও শ্রীপতিদত্তের 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টের' ইতো বা' (সন্ধি ৪৩) সূত্রের ভিত্তিতে চাক্রবর্মণের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তার রচিত ব্যাকরণ চাক্রবর্মণীয় ব্যাকরণ নামে পরিচিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন তার পিতার নাম ছিল চক্রবর্মা।

ভারদ্বাজ

পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে 'ঋতো ভারদ্বাজস্য' (৭/২/৬৩) সূত্রে ভারদ্বাজের নাম উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয় ভারদ্বাজের একটি বিশাল সম্প্রদায় ছিল এবং পাণিনীর পরেও এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। এমনকি কাত্যায়নের পূর্বে এই সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণরা পাণিনি সূত্রের উপর বার্তিক রচনাও করেছিলেন এবং সেই সমস্ত বার্তিকের কিছু কিছু পতঞ্জলি তার মহাভাষ্যে 'ভারদ্বাজীয়া: পঠন্তি' বলে তাদের মত উল্লেখ করেছেন। ঋক্‌তন্ত্রে মহর্ষি শাকটায়নের পূর্বোক্ত 'ব্রহ্মাবৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতিরিন্দ্রায়, ইন্দ্রো ভারদ্বাজায়...........' মন্ত্রের মধ্যেও ভারদ্বাজের উল্লেখ আছে। তবে এই সম্প্রদায়ের লোপ কবে হয়েছে তা সংশয়ান্বিত। ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণের কোন গ্রন্থও আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ নয়।

শাকল্য

অষ্টাধ্যায়ীর বেশ কয়েকটি সূত্রে শাকল্য মুনির নাম পাওয়া যায়- 'সংবুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে' (১/১/১৬) 'ইকোসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ' (৬/১/১১৭), 'লোপ: শাকল্যস্য' (৮/৩/১৯), 'সর্বত্র শাকল্যস্য' (৮/৪/৫১)। এছাড়াও ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য প্রভৃতি গ্রন্থেও

শাকল্যের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে শাকল্য মুনির সর্বাধিক প্রসিদ্ধি পদপাঠকাররূপে। এই পদপাঠেই বেদের প্রাচীন ব্যাকরণচর্চার বীজ নিহিত ছিল। কারণ পদপাঠ রচনায় ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস, স্বর প্রভৃতির গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যাই হোক এসব থেকে সহজেই বোঝা যায় যে ব্যাকরণশাস্ত্রচর্চায় শাকল্য মুনির বিশেষ অবদান ছিল।

সেনক

অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে আচার্য সেনকের নাম উল্লেখিত হয়েছে – 'গিরেশ্চ সেনকস্য' (৫/৪/১১২) অপর কোন গ্রন্থে এই আচার্যের তেমন কোন আর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

স্ফোটায়ন

সেনকের মতই আচার্য স্ফোটায়নের নামও অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে মাত্র উল্লেখিত হয়েছে- 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬/১/১২১)। কেউ কেউ মনে করেন তার নাম ছিল ঔদুম্বরায়ণ। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে ঔদুম্বরায়ণের নাম উল্লেখিত আছে। কাশিকাবৃত্তির অন্যতম বিখ্যাত টীকাকার হরদত্ত মিশ্র তার 'পদমঞ্জরী'-তে পূর্বোক্ত সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- 'স্ফোটায়নং পরায়ণং যস্য স স্ফোটায়ন:, স্ফোটপ্রতিপাদনপরো বৈয়াকরণাচার্য:।' এই উক্তি থেকে স্ফোটায়নকে সহজেই বৈয়াকরণ আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায়। অনেকের মতে ব্যাকরণশাস্ত্রের স্ফোটতত্ত্বে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বলে তার নাম স্ফোটায়ন। নাগেশ ভট্ট তার 'স্ফোটবাদ' গ্রন্থটি স্ফোটায়নের মত অনুসারেই রচনা করেছেন।

বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণ

পূর্বোক্ত তথ্য থেকে আমরা নিশ্চয় জানলাম যে পাণিনি বা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম/পঞ্চম শতক নয় তার বহুপূর্বেই বহু ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষাকে উপজীব্য করে ব্যাকরণশাস্ত্রের চর্চা করেছেন ভারতবর্ষের মাটিতে। মূলত এই চর্চার সূত্রপাত বৈদিক সময় থেকেই। এ প্রসঙ্গে প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থগুলি তথা বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও মন্ত্রগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে অথর্ববেদীয় 'মুণ্ডকোপনিষদ্' ও 'গোপথব্রাহ্মণ' গ্রন্থদুটি প্রাচীনভারতে ব্যাকরণচর্চার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। যেমন গোপথব্রাহ্মণের এক স্থানে বলা হয়েছে- 'কিং বৈব্যাকরণম্' (১/২৪)। এছাড়াও উল্লেখিত হয়েছে- ওকারং পৃচ্ছাম:। কো ধাতু:? ক: প্রত্যয়:? ক: স্বর:? কিং প্রাতিপাদিকম্? কিং নাম? কিমাখ্যাতম্? কিং লিঙ্গম্? কিং বচনম্..... ইত্যাদি। এমনকি অব্যয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে বহুপ্রচলিত কারিকাটি আমরা বলে থাকি-

"সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।

বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।।" (১/১৬)

এটিও গোপথব্রাহ্মণেই উল্লেখিত। মুণ্ডকোপনিষদে অপরা বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্টই ব্যাকরণের উল্লেখ করা হয়েছে- 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রপরা ঋগ্বেদো যর্জুবেদ: সামবেদোথর্ববেদ: শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।' মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ঋক্‌সংহিতায় ব্যাকরণের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঋক্ বেদের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন-

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।

ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্যা আবিবেশ।।" (৪/৫৮/৩)।

এই ঋক্‌টির অর্থ- এর চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুটি মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি (যজ্ঞীয় অগ্নি) অভিষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন এবং মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করছেন। পতঞ্জলি এটির ব্যাকরণপক্ষে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন- চত্বারি শৃঙ্গানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদা: ত্রয়: কালা: ভূতভবিষদবর্ত্তমানা:। দ্বে শীর্ষে শব্দাত্মানৌ নিত্য: কার্যশ্চ। সপ্ত হস্তাসো অস্য সপ্ত বিভক্তয়:। ত্রিধা বদ্ধ: ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভো বর্ষণাৎ। রোরবীতি পুন: পুন: শব্দং করোতি। এছাড়াও 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা...... (১/১৬৪/৪৫)', 'উতত্ব: পশ্যন্ন দদর্শ........ (১০/৭১/৪)', 'সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র...... (১০/৭১/২)', 'সুবেদো অসি বরুণ যস্য...... (৮/৬৯/১২)' প্রভৃতি ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে ব্যাকরণের গূঢ়তত্ত্ব চর্চিত হয়েছে। যাই হোক পূর্বোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাকরণচর্চার গোড়াপত্তন যে বৈদিক সময়েই হয়েছিল সেবিষয়ে কারোরই সংশয় থাকার কথা নয়।

বিদেশীয় ভাষার ব্যাকরণচর্চা

আমরা তো ভারতবর্ষে ব্যাকরণচর্চার সুপ্রাচীন ইতিহাস ও বৈয়াকরণদের চিন্তার সূক্ষ্মতা ও গভীরতার কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করলাম এবারে দেখব ভারতবর্ষের থেকে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে প্রচলিত তথা সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে সমাদৃত ভাষাগুলির ব্যাকরণচর্চার ক্রমবিকাশ। পাশ্চাত্যদেশের ব্যাকরণচর্চার কথা বলতে গেলে প্রথমেই গ্রিক ব্যাকরণের কথাই মনে আসে। মূলত এখানেই পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম ব্যাকরণ গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তার সময়টা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। মূলত গ্রিসের প্রখ্যাত কবি ইলিয়ড ও ওডিসির স্রষ্টা হোমারের সৃজনশীলতাকে বোঝার জন্য দিওনিসিউস্ থ্রাক্স (Dionysius Thrax) তেখ্‌নে গ্রামাতিকে (Tekhne Gramatike) নামে ব্যাকরণগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এটি পনেরো পৃষ্টার একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ। এতে ২৫টি অনুচ্ছেদ আছে। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হালিকারনাস্‌সুসের দিওনিসিউস্ এর এক সুদীর্ঘ টীকা লিখেছিলেন। এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্মেনীয় ও সিরিয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এই ব্যাকরণ গ্রন্থটি। তবে দিওনিসিউসের পূর্বেও অনেকেই গ্রীকভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে বেশ কিছু কিছু কথা বলেছিলেন কিন্তু তারা কেউই সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখেননি। এনাদের মধ্যে উল্লেযোগ্য হলেন প্রোতোগোরাস্ (খ্রিস্টপূর্ব ৫ শতাব্দী), প্লাতোন্ (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৯-৩৪৭), আরিস্তোতল্ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২), খ্রুসিপ্পুস্ (খ্রিস্টপূর্ব ২৮০-২০৭), দিওগেনেস্ বাবুলোনিউস্ (খ্রিস্টপূর্ব ২৪০-১৫২) প্রমুখ। তবে ভারতবর্ষের মত সুক্ষ্ম ও সুগভীরচর্চা এখানে হয়নি আর প্রাচীনত্বের নিরিখে তো এই গ্রন্থগুলি অনেক নবীন।

লাতিন ব্যাকরণ

পাশ্চাত্যের প্রাচীন ভাষা নিয়ে কথা হবে আর সেখানে লাতিন নিয়ে কথা হবে না তা নিতান্তই আকাশকুসুমসদৃশ ব্যাপার হবে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের মত পাশ্চাত্যে বিদ্যমান অর্ধেকের বেশি ভাষার মাতৃকা ভাষা হল লাতিন। রোমানরা যখন লাতিন ভাষার ব্যাকরণ লিখতে শুরু করেছিলেন তখন তারাও প্রথম অবস্থায় গ্রীক ভাষার ব্যাকরণকেই অনুসরণ করেছিলেন। লাতিন ভাষার প্রথম বৈয়াকরণ হলেন মারকুস্ তেরেন্তিউস্ বারো (Marcus Terentius Varro) সময়টা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১১৬-১৭/২৭। তার লিখিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম লা লিঙ্গুয়া লাতিনা (De Lingua Latina)। তিনি তার ব্যাকরণে শব্দার্থতত্ত্বের দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন এবং তার গ্রন্থে কারক প্রকরণটি প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কারকের অনুরূপ। মার্কুসের পরেও বহু বৈয়াকরণ লাতিন ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে কুইন্তিলিয়ান্ (১/ম শতাব্দী), দোনাতুস্ (৪র্থ শতাব্দী), প্রিস্কিয়ান্ (৫ম শতাব্দী), সেবিল্লের ইসিদোরে (৫৭০-৬৩৬ শতাব্দী) ছিলেন প্রমুখ।

ফরাসী ব্যাকরণ

ভারতবর্ষে বহুজাতি তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে ফরাসীরাও ছিল অন্যতম। অন্যদের মত ফরাসীরাও তাদের ভাষার অংশ ভারতবর্ষের মাটিতে রেখে গেছেন। আমরা এখন অনেকেই নতুন ভাষা শেখার নেশায় বা গবেষণার কাজের সুবিধার্থে ফরাসী ভাষা শিখি। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই বহুপ্রচলিত ভাষাটির ব্যাকরণ লেখার পরম্পরার ইতিহাস একেবারেই নবীন। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে দুইজন অজ্ঞাতনামা লেখকের হাত ধরে ফরাসী ভাষার ব্যাকরণ লেখার ইতিহাস শুরু হয়েছিল। লিখিত গ্রন্থটির নাম Tractatus Orthographies এবং অপর গ্রন্থটি হল Orthographia Gallica। পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে Alexander Barcley এর Introductory to write and Pronounce Frenche নামক গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও Erasmus-র De reita graecique sermonis pronunciatione প্রভৃতি ফরাসি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ইংরেজী ব্যাকরণ

বর্তমান সময়ে বহুপ্রচলিত এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে যে ভাষাটি বহুজন স্বীকৃত সেই ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণচর্চার ইতিহাসও খুবই নবীন। মূলত খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ লেখা শুরু হয়। প্রথম যারা ব্যাকরণ লিখতে শুরু করেছিলেন তারা হলেন ষোড়শ শতকের বুলোকার (Bullokar ১৫৮৬), ওগ্রীভস্ (Greaves ১৫৯৪)। এছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীতে তমকিস্ (Tomkis ১৬১২), হিউম্ (Hume ১৬১৭), গিল (Gill ১৬১৯), হিউএস্ (Hewes ১৬২৪), বাটলার (Butlar ১৬৩৩), থেকে আরম্ভ করে হেষ্টিং (Hastings ১৮০০), ডাল্টন্ (Dalton ১৮০১), লাভচাইল্ড (Lonechild ১৮১৫) পর্যন্ত প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ইংরেজি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে।

জার্মান ব্যাকরণ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লেখা শুরু হয়। জার্মান ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম Tactatus dans modum teutonisandi casus et tempora। তবে গ্রন্থটি লাতিন ভাষায় লেখা এবং গ্রন্থকারের নাম জানা যায়নি।

স্প্যানিস্ ব্যাকরণ

স্প্যানিস ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখা শুরু হয় ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে লেখকের নাম Aelius Antonius Nebrissensis (Antonio de Lebrixa)। গ্রন্থটির নাম Gramatica sobrela lengua Castellana। গ্রন্থটি Salamanca থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

পর্তুগীজ্ ব্যাকরণ

পর্তুগীজ্ ভাষার নিদর্শন ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া গেলেও তার ব্যাকরণচর্চার ইতিহাস অনেক নবীন। মূলত ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে J Nunes এর হাত ধরে Compendio de gramatica historica Protuguesa নামক গ্রন্থটি লিসবন থেকে প্রথম পর্তুগিজ ব্যাকরণগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। আরো কিছু বছর পরে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে Philadelphia থেকে E.B. Williams এর From Latin to Portuguese নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

পারসিক ব্যাকরণ

পারস্য ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে রোমে। লেখক হলেন J.B. Raymundus এবং গ্রন্থের নাম Rudimenta grammatices Petsicae.

আর্মেনীয় ব্যাকরণ

আর্মেনীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখেন F. Rivola। তার লিখিত গ্রন্থটির নাম Grammaticae Armenae Libri quatour এবং গ্রন্থটি মিলান থেকে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

আলবেনীয় ব্যাকরণ

আলবানীয় ভাষার অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে দেখতে পাওয়া গেলেও এই ভাষার ব্যাকরণচর্চা শুরু হয়েছে অনেক পরে, উনবিংশ শতাব্দীতে G Meyer এর হাত ধরে। তার লিখিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম Kurzge fasste Albanesische Grammatik এবং গ্রন্থটি লিপজিক থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে G Pekmezi এর Grammatik der Albanesischen Sprache এবং S. E. Mann এর Short Albenian Grammar প্রভৃতি আলবেনীয় ভাষার উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ।

হিব্রু ব্যাকরণ

সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা হল হিব্রু। এই ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগেকার। কিন্তু এই ভাষার ব্যাকরণচর্চা শুরু হয় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে। মূলত হিব্রুভাষায় বাইবেলের যে অনুবাদ হয়েছিল তার উপর নির্ভর করেই Rabbi Jona বা Abdul Walid Merwan ibn Djanah হিব্রু ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেছিলেন।

আরবি ব্যাকরণ

সেমেটিক গোষ্ঠীর আরেকটি প্রাচীন ভাষা হল আরবি। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর আগে এই ভাষার কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে T. Erpenius মহাশয় 'Grammatica Arabica' নামে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

চীনা ব্যাকরণ

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে চীনা ভাষা একটি। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগেকার চৈনিক সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু ব্যাকরণচর্চার তেমন কোন ইতিহাস দেখা যায়নি। তবে বর্তমানে বিগত তিন চারশো বছর ধরে চিনা ভাষার ব্যাকরণ রচনা হচ্ছে। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে A. Kricher মহাশয়ের China Illustrata নামে একটি চীনা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ আমস্টারদাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

তিব্বতি ব্যাকরণ

চীনা ভাষা গোষ্ঠীর আরেকটি ভাষা হল তিব্বতী ভাষা। তিব্বতী ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখিত হয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম 'সুম চু পা তাগ জুগ পা' লেখক হলেন থোউ মি সম ভোট। বিস্ময়ের বিষয় পাণিনি ব্যাকরণ রচনাশৈলীর সঙ্গে এর অনেক মিল আছে।

যাই হোক উপরের প্রদত্ত তথ্য ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষই হল অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মত ব্যাকরণশাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এবং তা মূলত সংস্কৃত ভাষার হাত ধরেই হয়েছে। ব্যাকরণচর্চার গোড়াপত্তন হিসাবে অনেকেই সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ী ও পাণিনির কথা বলে থাকেন। তথাপি ভারতবর্ষেই যে ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল তা স্বীকার করতে অনেকেই সংশয়ান্বিত হয়ে পরে। অনেকে তো আবার অন্ধ ভক্তের মত পাশ্চাত্যের দিকে ইঙ্গিত করতে চান। কিন্তু আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি দেখি তাহলে হয়ত আমরা যথাযথ সত্য উপলব্ধি করতে পারব। আশা করি এই প্রবন্ধটি জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে ক্ষুদ্র সহযোগিতা করবে ও যারা ভারততত্ত্বচর্চা করেন এবং যারা সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী তাদের সাহিত্যচর্চার আগ্রহ, উৎসাহ কিছুটা বাড়ালেও কৃতজ্ঞ হব।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গুরুপদ হালদার, ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০০৬, কলিকাতা।

২। ডঃ রামেশ্বর শ্ব, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

৩। অমিয় কুমার ভট্টাচার্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, কলিকাতা।

৪। রত্নামুন্সী, সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, কলিকাতা।

৫।সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বনাম বাংলা ব্যাকরণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, কলিকাতা।

৬। কালীজীবন দেবশর্মা (চক্রবর্তী), শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউশন অফ কালচার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৫, কলিকাতা।

৭। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা, ফার্মা কে এল্ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, কলিকাতা।

৮। সত্যকাম বর্মা, সংস্কৃত ব্যাকরণকা উদ্ভব ঔর বিকাশ, মোতিলাল বেনারসী দাস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১, দিল্লী।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation